

সংবাদ

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম- একটি পর্যালোচনা ও কতিপয় সুপারিশ

ড. ফোরকান উদ্দিন আহম্মদ

ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড যেকোন প্রতিষ্ঠান বা সংগঠনের একটি তাৎপর্যপূর্ণ বিভাগ। আজকাল অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এ বিষয় দুটিকে তেমন একটা গুরুত্বের চোখে দেখা হয় না। এই বিভাগটি অবহেলা, অনাদরে আর অযত্নে নিমজ্জমান। তার দেখাতনার জন্য মনে হয় কেউ নেই। যদিও স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম পরিচালনার জন্য শিক্ষক/প্রশিক্ষক নিয়োজিত থাকেন তথাপি তার কার্যক্রমের দিকে কর্তৃপক্ষের উদাসীনতা পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। কোন সংগঠন, কমিটি বা বিশেষ কর্মসূচি দিয়ে বর্ণিত সেক্টরটিকে কার্যকর করারও কোন বিশেষ পদক্ষেপ নিদেনপক্ষে গ্রহণ করা হয় না। যার ফলে আন্তঃ স্কুল-কলেজ পর্যায়ে ছাত্র-ছাত্রীরা অংশগ্রহণের মাধ্যমে নিজেদের প্রতিভার বিকাশ ঘটিয়ে জাতীয় মানে উন্নীত হতে পারে না। প্রাতিষ্ঠানিক উৎসাহ ও অগ্রহের ঘাটতির ফলে আমাদের শিক্ষার্থীরা সংশ্লিষ্ট বিভাগের প্রতি তাদের উৎসাহ হারিয়ে হাত-পা গুটিয়ে অলস, অসাড় মানুষের মত নিষ্পন্দ জীবনকে বেছে নিয়ে বসে থাকে। ক্রমেই এই শিক্ষার্থীরা তাদের তরুণ বয়সেই উদ্যম, তারুণ্য, কর্মস্পৃহা হারিয়ে হতাশায় নিমজ্জিত হয়ে বিপথগামী জীবনকে বেছে নেয়। এই বিপথগামিতার ফল হিসেবে তারা বিভিন্ন অসামাজিক, অশ্লীল কাজে জড়িয়ে পড়ে। অনেক সময় সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের মতো অনাকাঙ্ক্ষিত কর্মের দিকে ধাবিত হয়ে পড়ে। অধিকন্তু কেউ কেউ নেশার জালে আবদ্ধ হয়ে সমাজ ও পরিবারের জন্য দুর্ভোগ ডেকে আনে। এই অবস্থা থেকে তরুণ সমাজকে রক্ষার কাজে ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম টনিকের ভূমিকা পালন করে থাকে। কাজেই প্রাথমিক শিক্ষালয় থেকে শুরু করে কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল শিক্ষার্থীগণ যেন ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে প্রবেশ করে বিনোদনমুখী শিক্ষার মাধ্যমে বাস্তব,

ব্যবহারিক ও কর্মমুখী জীবনের পথে অগ্রসর হতে পারে। কর্তৃপক্ষের সেদিকে যত্নবান হওয়া উচিত। সদিচ্ছা ও আন্তরিকতার মাধ্যমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের এই দৈন্যদশার অবসান ঘটানো সম্ভব। ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রমকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। প্রাথমিক পর্যায়, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পর্যায়, বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয় প্রায় একই রকম সামান্য রদবদল করে একটি সিলেবাস তৈরি করতে পারে। বয়সের বিবেচনায় এই বিভাজন আবশ্যিক। কেননা বিভিন্ন বয়সে শিক্ষার্থীদের জন্য একই ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম ঠিক হবে না। মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরে বিতর্ক প্রতিযোগিতা, উপস্থিত বক্তৃতা প্রতিযোগিতা এ দুটি বিষয় অন্তর্ভুক্ত করতে পারলে ভালো হয়। এ ব্যাপারে প্রশিক্ষণ ক্লাসের আয়োজন করা প্রয়োজন। আমাদের অনেক শিক্ষার্থীর কমিউনিকেশন দক্ষতা খুব দুর্বল। সে যা ভাবছে তা সুন্দরভাবে প্রকাশ করতে পারে না। অনেকের এই দুর্বলতা সারা জীবনই থেকে যায়। স্কুল বা কলেজ পর্যায়ে কেউ এ রোগ সারানোর চিকিৎসা করে না। বিতর্ক ও উপস্থিত বক্তৃতার ব্যাপক চর্চার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের যোগাযোগ দক্ষতা বাড়ানো সম্ভব। প্রতিবছর শুরুর দিকে স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে সংস্কৃতি সত্তাহ উদযাপন করা উচিত। যেমন- গান, নাচ, চিত্রাংকন, বিতর্ক, উপস্থিত বক্তৃতা, অভিনয়, আবৃত্তি, রচনা লেখা ইত্যাদিতে যারা প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান অধিকার করবে, তাদের পুরস্কৃত করতে হবে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে সংস্কৃতি সত্তাহের এমন একটা আবহ তৈরি করতে হবে, যাতে বছরজুড়ে ছেলেমেয়েরা এই প্রতিযোগিতার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করে। বিভিন্ন ক্ষেত্রের স্থানীয় খ্যাতিনামা প্রবীণ শিল্পী ও তারকাদের

এসব অনুষ্ঠানে বিচারক হিসেবে আমন্ত্রণ করা হলে ছেলেমেয়েরা উৎসাহিত হবে। সংস্কৃতি সত্তাহে অবশ্যই বিজ্ঞান মেলারও আয়োজন করতে হবে, যাতে বিজ্ঞানের ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের সৃজনশীল প্রতিভা প্রকাশের সুযোগ পায়। স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন জাতীয় দিবস কীভাবে উদ্যাপিত হবে তারও একটা কাঠামো শিক্ষা মন্ত্রণালয় ঘোষণা করতে পারে। অন্তত তিনটি জাতীয় দিবসে (শহীদ দিবস, স্বাধীনতা দিবস ও বিজয় দিবস) সত্তাহব্যাপী নানা অনুষ্ঠান ও প্রদর্শনীর আয়োজন করা যায়। নিয়মিত ক্লাসের বিয় না ঘটিয়ে শেষের একটি বা দুটি পিরিয়ড বাদ দিয়ে সত্তাহব্যাপী সম্মিলিত অনুষ্ঠানের আয়োজন করা যায়। এসব অনুষ্ঠান দিবসের তাৎপর্য বর্ণনা করে বক্তৃতা, ইতিহাস নিয়ে আলোচনা, স্মৃতিচারণ, আবৃত্তি, গান, নৃত্য, নাটকসহযোগে বিচিত্রানুষ্ঠান, রচনা প্রতিযোগিতা, চিত্রাংকন প্রতিযোগিতা ও প্রদর্শনী, দিবসের সঙ্গে সম্পর্কিত বইয়ের সত্তাহব্যাপী প্রদর্শনী ইত্যাদি। এভাবে সাত দিন শিক্ষার্থীরা ঐ দিবসের নানা কিছুর মধ্যে থাকতে পারলে মূল জাতীয় দিবসে তারা অন্যরকম এক অনুভূতি নিয়ে মুক্ত অনুষ্ঠানে অংশ নিতে পারবে। প্রতিটি জাতীয় দিবসে সরকারি ছুটি থাকে। ছুটির দিনে তাদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে আসতে বলা ঠিক হবে না। সেদিন তারা অন্য সবার সঙ্গে গণ-অনুষ্ঠানে যাতে অংশ নেয়, সে ব্যাপারে উৎসাহিত করা উচিত। আমাদের স্কুলের পাঠ্যসূচিতে ধর্মীয় শিক্ষাও অন্যতম একটি বিষয়। সেই ধর্ম শিক্ষার বিষয়গুলো নিয়ে যৌক্তিক পর্যালোচনার কথাও বিবেচনা করা উচিত। ধর্মশিক্ষা নিয়ে কোনো ধরনের বিভ্রান্তির সুযোগ যাতে তৈরি না হয়, সেটা বিবেচনায় নিয়েই এই পর্যালোচনা হতে হবে। অনেকে বলতে পারেন, স্কুলের পিরিয়ড তো সীমিত। এত সাংস্কৃতিক কার্যক্রম তারা কীভাবে

করবে? খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। স্কুলে ক্লাসের সময় তো আর বাড়ানো যাবে না। সে ক্ষেত্রে দেখতে হবে কম প্রয়োজনীয় বিষয় কী কী আছে। উচ্চ পর্যায়ের একটি বিশেষজ্ঞ কমিটি করে কম প্রয়োজনীয় বিষয় বাদ দিতে হবে। একজন শিক্ষার্থীর মানসগঠনে সাংস্কৃতিক কার্যক্রম খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম স্কুল-কলেজের মতো হবে না। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে কো-কারিকুলাম হিসেবে বিভিন্ন ক্লাব রয়েছে। এসব ক্লাবকে শক্তিশালী করতে হবে। ক্লাবের কার্যক্রমে অংশগ্রহণের ভিত্তিতে নম্বর দিতে হবে। সব ক্লাবের কর্মসূচির ভিত্তিতে বছরের শুরুতে প্রতিযোগিতামূলক সাংস্কৃতিক সত্তাহের আয়োজন করতে হবে। শৈশব থেকে কৈশোর এবং কৈশোর থেকে যৌবনের প্রতিটি ধাপে যদি প্রাতিষ্ঠানিকভাবে ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রমকে গুরুত্ব দিয়ে এবং বিভিন্ন সামগ্রী ও সহায়তার মাধ্যমে তার সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয় তাহলে অদূর ভবিষ্যতে আমাদের তরুণদের মধ্য থেকে বিশ্বমানের জিম্নাস্ট, ফুটবল তারকা, ক্রিকেট লিজেন্ড হয়ে ক্রীড়া ও সংস্কৃতির অন্যান্য সকল কর্মকাণ্ডে এক বিশ্ময় তৈরি করে বাংলাদেশকে গৌরবের আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হবে। এ ক্ষেত্রে সরকারি ও বেসরকারি সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতার দরকার। এ ক্ষেত্রে শিক্ষা, ক্রীড়া ও সংস্কৃতি মন্ত্রণালয় সমন্বিতভাবে যুগোপযোগী নির্দেশনা ও নীতিমালা প্রণয়ন করে তা বাস্তবায়নে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। আর তা হলেই ক্রীড়া ও সংস্কৃতির মুখ উজ্জ্বল হবে এবং বিশ্ববাসীর কাছে দেশের ভাবমূর্ত্তিও বৃদ্ধি পাবে।

[লেখক: সাবেক উপ-মহাপরিচালক ও কমান্ডার, বাংলাদেশ আনসার ও ভিডিপি একাডেমি, গাজীপুর]